ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস ২০১২

প্রকাশনায় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র

মঙ্গলবার, ৪ বৈশাখ ১৪১৯, ১৭ এপ্রিল ২০১২

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

৪ বৈশাখ ১৪১৯
১৭ এপ্রিল ২০১২

বাণী

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।
আমি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান-কে যাঁদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়েছিল। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সংগঠকসহ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী সকল স্তরের জনগণকে। আমি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ বিশ্ব দরবারে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের সহায়তা, যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের পাশে দাঁড়ানোসহ মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুজিবনগর সরকার গঠনে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন আমি তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা আজো সে লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে দিন বদলের সনদ তথা 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছেন। পরিবর্তনের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশ গঠনে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবসে' দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানুক এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতিগঠনমূলক কাজে অবদান রাখুক -এই কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং

'This may be my last message; from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

[অনুবাদ : 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।']

এ ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ এ মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনারে সালাম গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪ বৈশাখ ১৪১৯
১৭ এপ্রিল ২০১২

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এদিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ অনুমোদন করা হয়। সেদিন থেকে এ স্থানটি মুজিবনগর নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশে অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল এই সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

জাতির পিতাকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রিসভার সদস্য করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ ও সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। এর ধারাবাহিকতায় একই বছরের ৩রা নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জাতীয় নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মা-বোনদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

জাতির পিতার হত্যাকারীদের প্রচলিত আদালতে বিচার ও রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে আমরা জাতি দায়মুক্ত হয়েছি। জেলখানায় নিহত ৪ জাতীয় নেতার হত্যা মামলার পুনর্বিচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জাতির চরম দুর্দিনেও যে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে চলা যায়, ১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসে তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি দেশবাসীকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪ বৈশাখ ১৪১৯
১৭ এপ্রিল ২০১২

বাণী

মুজিবনগর দিবস আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি গৌরবদীপ্ত দিন। বাঙালি জাতির দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে এ দিবসের নাম। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সারা বিশ্বে বাঙালি জাতির দীর্ঘ কাংখিত আত্মপরিচয় ঘোষিত হয় এদিনেই। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে দেশবাসী যখন মুক্তি সংগ্রামের জন্য উজ্জীবিত তখনই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্তিপাগল নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে। তবে বাঙালি জাতি এতে হতোদ্যম হয়নি। সারাদেশে গড়ে উঠে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল জাতীয় চার নেতা ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে গঠিত হয় ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে।

মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের মাধ্যমে এ সরকার বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধকে একটি সমন্বিত ও সুসংহত রূপ দেয়। ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের দিক নির্দেশনা ও বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

স্বাধীনতার ৪১ বছর পর মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আজও অম্লান। বিশেষ করে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা প্রতিহত করতে এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা একান্ত প্রয়োজন। এদিন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্য ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিন। আসুন, এ দিনটির চেতনা ধারণ করে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হই। সুখী-সমৃদ্ধ ও জঙ্গীবাদমুক্ত একটি বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ) এম, পি

স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি সংবিধান প্রণয়নের অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি সংবিধান রচনার জন্যে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচারমূলক ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করেছে এবং এখনো চালাচ্ছে এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্রে মিলিত হয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের সরকার গঠন করার সুযোগ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ওপর তাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে সেহেতু

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা, বাংলাদেশের মানুষ, যাঁদের অভিপ্রায় সবার ওপরে, তাঁদের প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করলাম এবং পারস্পরিক আলোচনাক্রমে এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা ও সাংবিধানিকভাবে তা গঠন করছি এবং এতদ্বারা ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা অনুমোদন করছি এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন, রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন, রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা অর্পণ করলাম এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪ বৈশাখ ১৪১৯
১৭ এপ্রিল ২০১২

বাণী

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর দিবস ইতিহাসের একটি অনন্যসাধারণ দিন। ১৯৭১ সালের এদিনে বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রথম আত্মপরিচয় ঘোষণার দিন এই মুজিবনগর দিবস।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তারই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় মুজিবনগর সরকার এর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন এ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও জনাব এএইচএম কামারুজ্জামান। আজকের এ বিশেষ দিনে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

মুজিবনগর সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়; যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে নতুন উদ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এই সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নতুন দেশ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বাঙালির ন্যায়সংগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত তৈরি হয় এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক সোচ্চার হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পথে মুজিবনগর সরকার ছিল শ্রেষ্ঠতম শুভসূচনা। মূলতঃ জাতির জনকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বই ছিল মুজিবনগর সরকার এর প্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি।

লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠাই হোক আজকের এই শুভদিনের দৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মিজানুর রহমান

মুজিবনগর দিবস ঃ ইতিহাসের অন্যতম মাইল ফলক

মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার, পিএসসি (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রতিটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের কিছু দিনক্ষণ থাকে যা সে জাতির শৌর্য, বীর্য, গৌরব, ঐতিহ্য ও অহংকারের মাইল ফলক এবং বাতিঘর হিসেবে কাজ করে। তেমনই একটি দিন ১৭ এপ্রিল, যা এখন মুজিবনগর দিবস নামে বাঙালির ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল মাইল ফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ষাটের দশকের শুরু থেকে বাঙালি জাতির জন্য যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন তার আইনগত বৈধ ভিত্তি রচিত হয় এবং রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার। শপথ গ্রহণের পর থেকেই বৈদ্যনাথতলার নাম হয় মুজিবনগর এবং ১৭ এপ্রিল হয় গৌরবের মুজিবনগর দিবস। নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ (বাংলার দ্বিতীয় মীরজাফর ও বিশ্বাসঘাতক)। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এই সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আমরা বিজয় অর্জন করি, অভ্যুদয় ঘটে শত্রুমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আক্ষরিক অর্থে বা শারীরিকভাবে অনুপস্থিত অর্থাৎ যুদ্ধের পুরো ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও ফলত এবং আত্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে এবং সারা বাংলার রণাঙ্গনে সদা সর্বত্র বিরাজমান ছিলেন। তাঁর নামেই সরকার ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বলে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের প্রায় ৯৩ হাজার প্রশিক্ষিত ও মতাদর্শগতভাবে ধর্মোন্মাদ সেনাসদস্যকে পরাজিত করে মাত্র ৯ মাসের মাথায় বিজয় অর্জনের প্রধান অনুঘটক ছিল একাত্তরের ১৭ এপ্রিলে শপথ গ্রহণকারি মুজিবনগর সরকার।

এ কারণেই এটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস স্থল। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার পর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হন। তার আগে তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের সকল সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও যুব নেতাদেরকে পরবর্তি করণীয় সম্পর্কে সব ধরণের ব্রিফিং দেন বঙ্গবন্ধু এবং আত্মগোপন করে যথাস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। তাজউদ্দিন আহমদ ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা হয়ে ৩০ মার্চ কলকাতায় পৌছান। এপ্রিলের ৪ ও ৫ তারিখে দুইবার তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লিতে ভারতের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বস্তুত এরপর তাজউদ্দিন আহমদ একটি শক্তিশালি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে মুক্ত করার অন্যতম উপাদান বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে সরকার গঠনের যাবতীয় আয়োজনে অগ্রসর হন। দিল্লিতে বসেই তাজউদ্দিন আহমদ সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো এবং মৌলিক কিছু নীতি যেমন, রাষ্ট্রের নামকরণ, আদর্শ, পররাষ্ট্র নীতি এবং বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক নির্ধারণ করেন। এসব নির্ধারণে গাইড লাইন হিসেবে ১৯৭০ সালের ৪ জুন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বিঘোষিত নীতি ও গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেন। তাজউদ্দিন আহমদের কণ্ঠে দিল্লিতে বসেই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ রেকর্ড করা হয় (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ১৫ খন্ড-পৃ: ১০৮, ১০৯)। ভাষণটি ১০ এপ্রিল রাত ৯ টায় প্রথম আকাশবাণীর একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়, যা পরের দিন ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পুনঃপ্রচার হয় (প্রাগুক্ত-পৃ- ১১৪)। তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লি থেকে ফিরে এসে সর্ব বিষয়ে আলোচনার জন্য ৮ এপ্রিল কলকাতার ভবানীপুর এলাকার একটি বাড়িতে ইতোমধ্যে কলকাতায় আগত সকল আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্র নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ আলোচনা এবং সকল মতপার্থক্য নিরসনান্তে তাজউদ্দিন আহমদের প্রস্তাবিত সরকার সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। ১০ এপ্রিল সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রচারিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং আকাশবাণী থেকে। সেদিন এই ঘোষণা শুনে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ যুদ্ধে নিয়োজিত সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রকৃতপক্ষে সকল বাঙালির মধ্যে যে প্রচন্ড মনোবল ও অভূতপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা কেবল কবির ভাষায়ই বলা যায়। 'আমি সেই দিন হব শান্ত/যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না-/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-।' পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের ভূখন্ডের ভেতরে সরকারের প্রকাশ্য শপথ অনুষ্ঠান ১৪ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় করার জন্য সিদ্ধান্ত হয় (প্রাগুক্ত-পৃঃ- ১১৮)। কিন্তু যে কোন কারণে সংবাদটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৩ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা আক্রমন করে। ফলে শপথ অনুষ্ঠানটি কয়েকদিনের জন্য বিলম্বিত হয়। পরবর্তিতে স্থান হিসেবে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকে ঠিক করা হয় এবং তারিখ নির্ধারিত হয় ১৭ এপ্রিল, যা কেবলমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ও দু'য়েকজন ছাড়া ওইদিন সকাল পর্যন্ত অন্য কেউ জানতেন না। ১৭ এপ্রিল সকালে কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে প্রায় শতাধিক গাড়িতে করে সাংবাদিকদের বৈদ্যনাথতলায় নিয়ে আসা হয়। তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য নেতারা পৌছানোর পর সকাল ১১ টায় শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যাপক ইউসুফ আলি শপথ বাক্য পাঠ করান এবং স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত সনদ পড়ে শোনান। গার্ড অব অনার এবং উপস্থিত জনতার জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সরকারের আইনগত ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা সনদটির মূল্য ছিল অপরিসীম। ঘোষণায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন দেয়া হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট ও তদানুসারে নব গঠিত সরকারের করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। বস্তুত পক্ষে যুদ্ধের পুরো ৯ মাস এই ঘোষণাপত্রই বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে কাজ করে। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার পর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সনদ ঘোষণা ব্যতিত আর কোথাও অনুরূপ স্বাধীনতা ঘোষণার সনদ প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা দেখা যায় না। আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন এবং বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক আফগানিস্থানে যুদ্ধ পরিচালনা এবং সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চাদপসারণের অব্যবহিত পর অভ্যন্তরীণ উপদলীয় সংঘর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি বৈধ সরকার গঠনের গুরুত্ব ও ভূমিকা কতখানি ছিল। শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতাকামী সংগঠন এলটিটিই দীর্ঘ ২৬ বছর যাবত গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েও শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনের স্বীকৃতির অভাবে চরমভাবে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ২৬ মার্চের পর সারা দেশব্যাপি প্রতিরোধ যুদ্ধেরত স্থানীয় নেতারা সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ভীষনভাবে অনুভব করছিলেন। মোবাইলহীন সময়ে আঞ্চলিক নেতাদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের কোন সুযোগ ছিল না।

এমতাবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে একাধিক সরকার গঠন করলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। এরকম হলে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ পরিচালনার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেত। আর এ ধরণের কোনো সরকারের সঙ্গে শত্রু পক্ষ যোগাযোগ করে মুক্তিযুদ্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ কর্তৃক একটি সরকার গঠন করা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদ সব দিক থেকেই মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার কাজটি ছিল যথার্থ এবং সময়োপযোগী। শপথ অনুষ্ঠানের পরে কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপন করা হয় এবং মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে।